সমকাল

তারিখ ২1 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কী আদর্শ নিয়ে যাবেন পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রীর কাছে

সময়ের কথা | অজয় দাশগুপ্ত

সাংবাদিক

স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা স্যামসন এইচ চৌধুরীর একটি লেকচার শোনার জন্য কয়েক বছর আগে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বিশাল ক্যাম্পাসের স্থাপত্য সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হই। পরে অনেককে বলেছি, সুযোগ পেলে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ স্থানটি দেখে চোখ জুড়িয়ে আসবে। এটাও স্মরণ করিয়ে দেই যে, ভেতরে প্রবেশ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি আছে কি-না, কেন যাবেন– এসব নানা প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলে পড়তে হবে গোলকধাঁধায়– কোন পথে যে চলি!

স্যামসন এইচ চৌধুরী বক্তব্য রেখেছিলেন কীভাবে উদ্যোক্তা হতে হয় সে বিষয় নিয়ে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে। কীভাবে নেতা হয়ে উঠতে হয়, অন্যদের পথ দেখাতে হয়– শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে সেসব শুনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। আলোচনা শেষে এক শিক্ষকের কক্ষে তিনি ব্যক্তিগত আরও নানা প্রসঙ্গে বলেন। তার বিশেষ আকর্ষণ ছবি তোলায় এবং এজন্য প্রায় প্রতিদিন ভোরে বের হয়ে যান ক্যামেরা নিয়ে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হওয়া এক শিক্ষার্থীর কাছে জেনেছিলাম– প্রতিষ্ঠানের প্রথম সিমিস্টারে ভর্তি হওয়া এক ছাত্রকে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল এভাবে– তুমি বনানী এলাকায় একটি গিফটশফ চালু করতে চাও। এখানে কোন কোন আইটেমের চাহিদা থাকবে, ফিক্সড প্রাইস রাখা ঠিক হবে কি-না– এসব বিষয়ে অনুসন্ধান-জরিপ চালিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। একজন শিক্ষার্থীকে এভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা আমার ভালো লেগেছিল। প্রতিষ্ঠানটি উচ্চমানের শিক্ষা প্রদানের ধারা বজায় রেখেছে, এটা ধরে নিতে পারি।

তবে বজ্র আঁটুনিতে ফসকা গেরো থাকে সর্বত্র। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ও ব্যতিক্রম হবে কেন? এ বিশ্ববিদ্যালয়টিই গত কিছুদিন ধরে আলোচনায় একেবারে ভিন্ন কারণে। শুধু এ প্রতিষ্ঠানটি নয়, সরকারি-বেসরকারি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এখন এমন কারণে আলোচনায়, যার সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের ঐতিহ্য একটুও যায় না। ছাত্রছাত্রীদের প্রধান দায়িত্ব পড়াশোনা এবং এজন্য সর্বোত্তম পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের। কিন্তু আমাদের এ ভূখণ্ডে এমন কিছু সময় এসেছে যখন ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে ক্লাসরুম ছেড়ে রাজপথে নেমে এসেছে। তারা পুলিশের লাঠিপেটা খেয়েছে, কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁজে পড়েছে, গুলিতে আহত হয়েছে কিংবা প্রাণ দিয়েছে। এমনটি ঘটেছে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের আদেশ দিলে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের ডাকে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে। দিনের পর দিন বন্ধ থাকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৯ সালে এই ছাত্রসমাজই রাজপথে নামে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের দায়ের করা কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিলের দাবিতে। এ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ১১ দফা ইস্যুতে, যার মধ্যে শিক্ষার দাবিও ছিল। কিন্তু জনগণের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তথা বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবি অকুতোভয়ে তুলে ধরেছিলেন যে নেতা সেই 'শেখের বেটা' বা 'মজিবরের' মুক্তি। ছাত্রসমাজের ডাকে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক-পেশাজীবী সবাই শামিল হয়েছিল। ২৪ জানুয়ারি (১৯৬৯) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যে হরতাল ডাকে তাতে বিভিন্ন সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি থেকে শুরু করে পিয়ন-দারোয়ান পর্যন্ত এক মিছিলে শামিল হয়েছিলেন। ওই আন্দোলনের ব্যাপকতা এমন ছিল যে, ঢাকা বিমানবন্দরে হরতালের সময় আটকে পড়া পাকিস্তান আর্মির একটি দল শহরের ওপর দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে গাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে তাদের বলা হয়– আগে তোফায়েল আহমেদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। তোফায়েল আহমেদ সে সময়ে ডাকসুর ভিপি হিসেবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এখন বাণিজ্যমন্ত্রী। ওই সময়ে জনগণের কাছে ছাত্রসমাজের ভাবমূর্তি এমন ছিল যে, কলকারখানায় মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ কিংবা জমিজমার বিরোধ মেটানো থেকে শুরু করে বহু বিষয়ে সাহায্যে তাদের মধ্যস্থতা করার অনুরোধ আসত। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মেটাতেও দু'পক্ষ হাজির হতেন ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ইকবাল হলে (১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল)। আমি ব্যক্তিগতভাবেও এ ধরনের ঘটনার সাক্ষী। ১১ দফার আন্দোলনকে বলা হয় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ড্রেস রিহার্সাল। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্য অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে এই ছাত্ররাই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং দেশের নির্বাচিত নেতৃত্ব তার স্বীকৃতি দেন। এই ছাত্ররাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা...' গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত করে এবং বাংলাদেশের প্রথম সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আম্রকাননে শপথ গ্রহণের সময় তার স্বীকৃতি দেয়।

আশির দশকে এইচএম এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে নিজের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য একের পর এক স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নিতে থাকেন। তখন ছাত্ররাই তা রুখে দিতে উদ্যোগী হয়। তিনি অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলের কিছুদিন পর ঘোষণা করেন– কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরি হবে না, একুশের গান হবে না, আলপনা হবে না, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না। এদিন শহীদ মিনারে আয়োজন হবে মিলাদের। কারণ দিনটি কয়েকজন মানুষের মৃত্যুদিন বই আর কিছুই নয়। ছাত্ররাই এর প্রথম প্রতিবাদ করে। তারপর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ১৫ দল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সে সময়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি এইচএম এরশাদের এই ধর্মান্ধ অবস্থানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেনি। তারা এরশাদের বিরুদ্ধে ছিল; কিন্তু ঐক্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মীয় চরমপন্থি দলের প্রতি, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যাদের বিশ্বাস নেই। তাদের হাত ছিল ১৯৭১ সালে লাখ লাখ বাঙালির রক্তে রঞ্জিত। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যাদের বিচার ও দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে তাদের সঙ্গে বিএনপির ঘনিষ্ঠ মিত্রতা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। তারও আগে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন আনা হয়। দৃশ্যপটে আসেন সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউর রহমান। তিনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার অনুমতি দেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাঙালি হত্যায় জামায়াতে ইসলামীসহ যেসব দলের নেতাকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল, তাদের ফের বাংলাদেশে রাজনীতি করার অনুমতি দেন। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া এই অপশক্তির দুই প্রধান নেতাকে মন্ত্রিসভাতেও স্থান দেন।

১৯৯০ সালে এইচএম এরশাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আন্দোলনে ছাত্রদের ব্যাপক ঐক্য গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নিয়ে গঠিত জোটে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির বাদে সব সংগঠনের স্থান হয়। এ আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দল শামিল হয়। বলা যায়, আমাদের এ ভূখণ্ডে এই প্রথম ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন চলে পাশাপাশি, প্রায় সমান্তরালভাবে।

কিন্তু এরপরের ইতিহাস করুণ। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি মন্ত্রিসভা গঠন করে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে। তাদের ক্ষমতায় আসার পেছনে দলীয় ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অবদান ছিল। আশির দশকের ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ সংগঠনটি দেশের প্রধান ছাত্র সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৮৯ সালে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন জোট গঠন করে জয়ী হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের জোট হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অন্য সংগঠনগুলোর জোট হয়নি। ফলে ছাত্রদলের আমান-খোকন পরিষদ সহজেই জিতে যায়।

১৯৯১ সালের পর আমাদের রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। জামায়াতে ইসলামী ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপির জোটসঙ্গী থাকে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী পৃথকভাবে নির্বাচন করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয় এবং জামায়াতে ইসলামীর ভরাডুবি ঘটে। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী উভয় দল তখন থেকেই বুঝে যায়, তাদের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। একে অপরকে ছাড়া চলবে না। এ সময় ছাত্রদলের সঙ্গে ইসলামী ছাত্রশিবিরেরও প্রকাশ্যে বা আড়ালে সখ্য গড়ে উঠতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় তাদের আস্থা নেই। বরং ১৯৭১ সালের গৌরবগাথা তাদের কাছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়। ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের নেতৃত্বে যে অন্যান্য আন্দোলন গড়ে ওঠে, শাহবাগ থেকে ক্রমে যা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে তার ঘোর বিরোধিতা করে ইসলামী ছাত্রশিবির। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া এ আন্দোলনকে অভিহিত করেন নাস্তিকদের আন্দোলন হিসেবে। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের প্রথম তিন মাস দেশব্যাপী ইসলামী ছাত্রশিবির সশস্ত্র তাণ্ডব চালায়। তাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কখনও প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিল, কখনও-বা কাজ করেছে পরোক্ষ সহযোগী হিসেবে। ছাত্রদের মধ্যে এ দুটি ছাত্র সংগঠনের মিলিত প্রভাব যথেষ্ট ছিল। তদুপরি, ইসলামী ছাত্রশিবির অর্থবিত্তেও হয়ে ওঠে প্রবল। তারা ছাত্রছাত্রীদের টার্গেট করে বৃত্তি দেয়, থাকার জন্য মেসের ব্যবস্থা করে, বই ও অন্যান্য উপকরণ জোগান দেয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। এদের মধ্যে মাদ্রাসায় পড়ছে প্রায় ৪০ লাখ। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা এক লাখের বেশি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী সাড়ে চার লাখের বেশি। মাদ্রাসা ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'রাজনীতিমুক্ত'; কিন্তু রাজনীতি জাঁকিয়ে আছে দারুণভাবে। এসব প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠনগুলোর কোনো সংগঠন নেই। তারা নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে বন্দি। কিন্তু ধর্মের নাম নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা যায় সহজেই। পাখি বা বায়ুর যেমন কোনো সীমানা নেই, তেমনি ধর্মান্ধতার কাছেও কোনো মেটাল ডিটেক্টর বা আর্চওয়ে অচল। দেশে প্রায় একশ' বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। উন্নত দেশগুলোতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় মূলত ট্রাস্টের মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাদেশে স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৭ জুলাই জঙ্গিবাদবিরোধী বৈঠক করে '৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক ও উপাচার্যদের' সঙ্গে (প্রথম আলো, ১৮ জুলাই)। জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ স্থান বিশ্ববিদ্যালয় কি চায়ের দোকান নাকি কারখানা যে মালিক থাকবে? দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশে এটা রয়েছে। এই মালিকদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মুনাফা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর এ মুনাফা বাড়াতে যদি ধর্মান্ধ চরমপন্থি গোষ্ঠীর তহবিল আসে, বানের পানির মতো, তাতে আপত্তি থাকার তো কথা নয়।

এটাও দুর্ভাগ্য যে, এসব প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদী চেতনার প্রসারে সক্রিয় অপশক্তির ফাঁদে হয়তো পড়েছে হাতেগোনা কয়েকজন। কিন্তু বদনাম হচ্ছে সব ছাত্রছাত্রীর। তারা ধর্মের অজুহাতে কিংবা নানা ছলছুতোয় ক্যাম্পাসে বিঘ্ন ঘটায়। তাদের অপপ্রচারে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পর্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা দেখেছি ধর্মের অবমাননার অজুহাতে তুলকালাম কাণ্ড ঘটাতে। নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলে এই ধর্মের নামেই অপবাদ দেওয়া হয়েছিল একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষকের নামে এবং এর সঙ্গে জড়িত আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন এক নেতার পরিবারের সদস্যরা। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে না, গোটা দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে প্ররোচনা দেয়। কীভাবে এর মোকাবেলা সম্ভব? আমরা যদি ধর্মীয় চরমপন্থি শক্তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করি, তাহলে তারা নববিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা আছে বাঙালি জাতির। আমরা বুঝতে পারি, ধর্মান্ধতা আর ধর্মীয় অনুশাসন পালন এক নয়। আলবদর ও রাজাকার বাহিনী ধর্মের নামে মাঠে মেনেছিল। পাকিস্তানের নিষ্ঠুর সেনাবাহিনীও মুখে নিচ্ছিল ধর্মের নাম। কিন্তু কাজ করেছে অধর্মের। আমাদের নতুন প্রজন্ম, ডিজিটাল যুগের প্রজন্ম নিশ্চয়ই এ বাস্তবতা উপলব্ধি করবে।

এখন দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়ছে প্রায় দুই কোটি ছাত্রছাত্রী। নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ২২-২৩ হাজার। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দেড় কোটিরও বেশি। সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩০ লাখের বেশি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পড়ছে পাঁচ লাখের মতো ছাত্রী। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতির অনুমতি দাবি করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, ধর্মান্ধ চরমপন্থি রাজনীতির সমর্থকরা সেখানে গোপনে কাজ করছে; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলার জন্য সভা করার অনুমতি মেলে না। কারা অনুমতি দেয় না– 'মালিক এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন'। এ বাধা দূর করতে হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, ষাটের দশকে বাঙালির অধিকার আদায়ের আন্দোলনেও ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বাধা দিয়েছেন সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা। এ বাধা মানা হয়নি। এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও রয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রী। তাদের কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের কি আয়োজন আছে? বাংলাদেশে বহু বছর ছাত্র ইউনিয়নসহ কয়েকটি বাম ধারার ছাত্র সংগঠনের প্রভাব ছিল। এখন তারা হীনবল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সক্রিয় ছাত্র সংগঠন হিসেবে সক্রিয় একক সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। কিন্তু এই পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছানোর তাদের কার্যকর কোনো পরিকল্পনা আছে কি? সরকার সাড়ে চার কোটি ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বই দিচ্ছে। এ বইয়ে আদর্শ আছে। তাদের পাঠদান করেন পাঁচ লাখের বেশি শিক্ষক। তারাও চেতনা ছড়িয়ে দিতে পারেন। আর আছে সরকারি ব্যয়ে নির্মিত দালানকোঠা। কিন্তু এসবই কি দেশের প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বার্থ তুচ্ছ করে ছাত্রসমাজের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট?

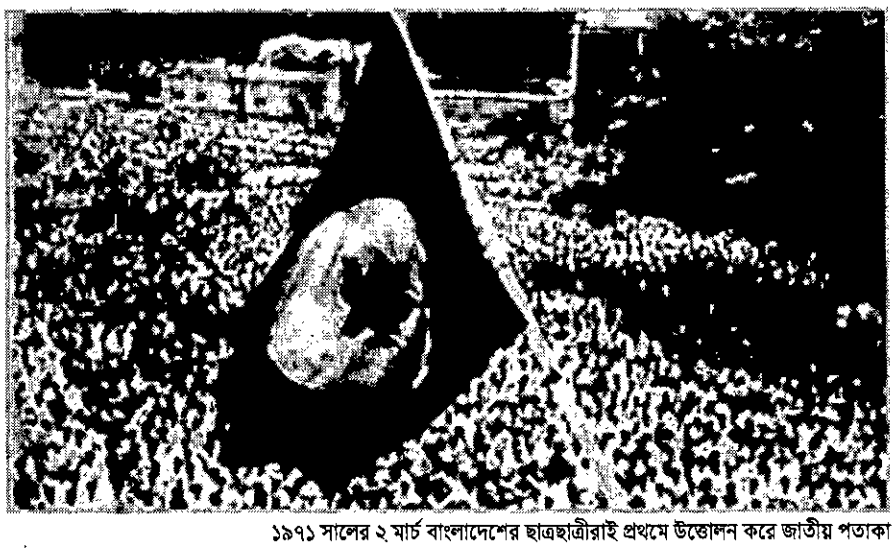

ajoydg@gmail.co

১৯৭১ সালের ২ মার্চ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরাই প্রথমে উত্তোলন করে জাতীয় পতাকা

বজ্র আঁটুনিতে ফসকা গেরো থাকে সর্বত্র। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ও ব্যতিক্রম হবে কেন? এ বিশ্ববিদ্যালয়টিই গত কিছুদিন ধরে আলোচনায় একেবারে ভিন্ন কারণে। শুধু এ প্রতিষ্ঠানটি নয়, সরকারি-বেসরকারি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এখন এমন কারণে আলোচনায়, যার সঙ্গে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের ঐতিহ্য একটুও যায় না। ছাত্রছাত্রীদের প্রধান দায়িত্ব পড়াশোনা এবং এজন্য সর্বোত্তম পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের। কিন্তু আমাদের এ ভূখণ্ডে এমন কিছু সময় এসেছে যখন ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে ক্লাসরুম ছেড়ে রাজপথে নেমে এসেছে। তারা পুলিশের লাঠিপেটা খেয়েছে, কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁজে পড়েছে, গুলিতে আহত হয়েছে কিংবা প্রাণ দিয়েছে